***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 167–170*
*Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*e ISSN : 2583 – 0848 (Online)*

# মতি নন্দীর 'বিজলিবালার মুক্তি' : সংস্কার ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব

তমা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : tamadas1609@gmai.com

## Keyword
দ্বন্দ্ব, মানব-সঞ্চরণ, সংস্কারপূর্ণ বাতাবরণ, মানবিকতা, মানবপ্রেম, লালিত নিষ্ঠাবোধ, প্রায়শ্চিত্ত, উপলব্ধি, উত্তরণ।

## Abstract
মতি নন্দীর 'বিজলিবালার মুক্তি' উপন্যাসটি কাহিনীর নামচরিত্র বিজলিবালার ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধে মানবিকতার মুক্তির কাহিনী। এক গোঁড়া হিন্দু রমণী যিনি সকাল শুরু করেন, দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করেন সনাতনী আচার-নিয়ম নিয়ে। সংস্কারের পাশাপাশি তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ প্রথম থেকেই ছিল। সামান্য রিকশাওয়ালা থেকে বাড়ির পারিচারিকা কিংবা বাড়ির ভাড়াটে সবাইকে তিনি আপন করে নিতে পারেন। কিন্তু সবটাই সংস্কারের প্রলেপে মুড়ে। তার সেই সংস্কারের প্রলেপে দাগ লাগলে ক্ষণিকের জন্য তার মানবিকতা বিলীন হয়ে যায়। তারপরেও সংস্কারের প্রলেপ ভেঙে মানবিকতার আভা উদ্ভাসিত হয়।

## Discussion
মানব জীবন দ্বন্দ্বমুখর। ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম, সংস্কার-যুক্তির প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলছে সেখানে। এই সংঘর্ষ, চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে থেকেই সে তার অস্তিত্ব স্থাপন করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব নেতিবাচক হলেও কখনও কখনও তা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে মানবচেতনার উত্তরণ ঘটায়। এই উত্তরণের পথ সহজ নয়। নানা পারিপার্শ্বিক টালমাটাল এসে তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। তা থেকেই বেড়িয়ে এগিয়ে চলেছে মানব-সঞ্চরণ। তার অগ্রগতির পথে পাশে পেয়েছে বিশ্বায়ন, রেনেসাঁ। এ শুধু দু'টি শব্দমাত্র নয় জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি। বিশ্বায়ন, রেনেসাঁর প্রভাবে মানবপ্রযুক্তির উন্নয়ন তো হয়েছেই। কিন্তু তার চিন্তা-চেতনার সনাতনী ভাবমূর্তির বদল কি ঘটেছে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। পরিচিত গণ্ডী থেকে বের হতে চাইলেই বের হওয়া যায় না। গণ্ডী অতিক্রমের জন্য শুধু পারিপার্শ্বিক সমাজ কিংবা পরিস্থিতি নয়, তাদের সংস্কারের দেয়ালও সামনে এসে দাঁড়ায়, তারা নিজেরাই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে। আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেই নিজের উত্তরণের পথ বের করে খুঁজে আনে।

অপরদিকে সংস্কার মানবজীবনের ফুসফুস। সংস্কারহীন মানবজীবন যেন নিরুদ্যম প্রবাহ, রসহীন। সৃষ্টির আদি থেকে ধর্মের লাল চোখের কষাঘাতে সে সংস্কার অনেকবারই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়েছে মানবিকতাবোধ,

মনুষ্যত্ব। মানবিকতার কাছে পৃথিবীর সমস্ত সংস্কারপূর্ণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে অচেনা। মতি নন্দী 'বিজলিবালার মুক্তি' সেরকমই এক সংস্কারপূর্ণ বাতাবরণে দ্বান্দ্বিক মনুষ্যত্বের জয়গানের প্রতিভাস।

হুগলি জেলার ভেনিয়াপুর গ্রামের বিজলিবালা তেতাল্লিশ বছর আগে হাতিবাগানে বিবাহ করে আসার পর থেকে প্রতি বছরই গিয়েছেন উত্তর কলকাতার চৌধুরীদের রাধাবল্লভ ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার রথের রশিতে টান দিতে। প্রথমে যেতেন শাশুড়ীর সাথে, শাশুড়ীর মৃত্যুর পর স্বামী কৃষ্ণকিশোরের সাথে। সময় থেমে না থাকলেও সংস্কার থেকে যায়। এরপর স্বামীও মারা যান, তবুও বিজলিবালার রথের রশিতে টান দেওয়া থেমে থাকে না। সংস্কারের বশে একাই চলে যান রথের রশিতে টান দিতে।

বাঙালীর প্রতিটি উৎসবের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বিশেষ কিছু খাদ্য। সেটিও তার সংস্কারের মধ্যে পড়ে। বিজলিবালাই বা বাদ যেতে যাবেন কেন; রথের দিন পাঁপড় ভাজা খাওয়ার সংস্কার তার মধ্যেও রয়ে গিয়েছে।

> "রথের দিন পাঁপড় খাওয়ার ইচ্ছেটা ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে মনের মধ্যে সেই যে ঢুকে গেল তারপর এই পঞ্চাশ বছরে দু'-তিনবার ছাড়া সব বছরই মেনেছি।"[১]

সংস্কার তার এতটাই তীব্র যে পাঁপড় না খাওয়ার কারণটাও তার মনে রয়েছে- প্রথমবার শ্বশুরের মৃত্যু, দ্বিতীয়বার শাশুড়ির অম্লশূলের ব্যথার জন্য হাসপাতালে শাশুড়ির বেডের পাশে। এমনকি রথ দেখে ফেরার পথে রিকশা উল্টে পা ভেঙে যাওয়াতে তার তো পাঁপড় খাওয়া না হলেও তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াতে সাহায্যকারী ক্লাবের ছেলেগুলোকে পাঁপড় খাওয়াতে ভোলেন না।

> "পদ্ম, যাবার সময় পাঁপড় কিনে নিয়ে যাবি। এদের খাওয়াবি তুইও খাবি। পলাশ তোমরা ক্লাবের ঘরে এখন থাকবে তো, পদ্ম পাঁপড় ভেজে দিয়ে আসবে, রথের দিনে একটু মুখে দিয়ো।"[২]

পৌষপার্বণে যেমন পিঠে, জন্মদিনে পায়েস, তেমন রথে পাঁপড় না খেলেই যেন নয়।

পা ভেঙে পড়ে থাকাতে বিজলিবালার পুজো হচ্ছে না। পুজোর ব্যাপারে তিনি ভীষণ নিষ্ঠাবান ও সচেতন, যাকে তাকে দিয়ে তিনি তার ঠাকুরদের পুজো নিবেদন করাতে পারেন না-

> "এসব হল হিন্দুদের আচার প্রথা নিয়ম। ...হাজার হাজার বছর আগে মুনিঋষিরা এসব বিধান দিয়ে গেছেন। ওনারাই ঠিক করে দিয়েছেন সমাজে কারা উঁচু কারা নিচু, সেই ভাবেই মানুষ ভাগ করা।"[৩]

ধর্ম-বর্ণভেদকারী গ্রন্থাদিতে এই শ্রেণীবিভাগ যতটা ছিল বাঙালি তাকে আরও পুষ্ট করেছে।

> "...বর্ণ বিন্যাস ভারতীয় সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি। খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ-ব্যাপারের বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করিয়া আর্যপূর্ব ভারতবর্ষে যে সমাজ ব্যবস্থার পত্তন ছিল তাহাকে পিতৃপ্রধান আর্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিল।"[৪]

বর্ণভেদের সেই পুষ্ট রূপ দেখি এখানে। বিজলিবালাকে দেখাশোনা করে পদ্ম। পদ্ম বামুন না, কিন্তু অলকাকে দিয়ে তো বিজলিবালা পুজো করাতেই পারে। পুজোর সময় নতুন শাড়ী পড়ে ঠাকুর দেখতে বের হলেও অলকা প্রতিমাকে প্রণাম করে না, শাঁখা-সিঁদুর পড়ে না। 'বামুন' হলেও তাই অলকাকে দিয়ে পুজো করানো যায় না-

> "বামন বামুন ব্রাহ্মণ নয় রে ব্রাম্-হো। ওরা ঠাকুর দেবতা মানে না, পুজোআচ্ছা করে না, ওদের ধর্ম আমাদের মতো নয়। ওদের বিয়েতে হোম যজ্ঞটজ্ঞ হয় না, পিণ্ডি দেয় না শ্রাদ্ধে।"[৫]

আপাদমস্তক সংস্কারপূর্ণ বিজলিবালা শুধু ইহকাল নয়, পরকালের চিন্তাও করে। বিজলিবালার মৃত্যুর পর পদ্ম বিজলিবালার শ্রাদ্ধের দায়িত্ব না নিতে চাইলে বিজলিবালা গর্জে ওঠে-

> "তার মানে তুই বলছিস আমার শ্রাদ্ধ হবে না! আমার আত্মার গতি হবে না? আমি প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াব?"[৬]

ভালোভাবে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করার জন্য বিজলিবালা পোস্টাপিসে আর ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে সব পদ্মকে দিয়ে যাবে। পুনর্জন্মে বিশ্বাসী বিজলিবালার ভয় পাছে তাকে কুকুর, ছারপোকা হয়ে না জন্মাতে হয়। রাজার ঘরে জন্ম হলেও তো আবার সেই মানবজন্মের দুঃখকষ্ট ভোগ করা তাই তাকে যেন আর জন্মাতে না হয় পদ্ম যেন সেই ব্যবস্থা করে-

> "পদ্ম একটা কথা দে, গয়ায় গিয়ে আমার পিণ্ডি দিবি। নয়তো আমার মুক্তি ঘটবে না রে, আবার তা হলে আমাকে জন্মাতে হবে!"[৭]

বাড়ির ভাড়াটে বামুনের বউ হাসিকে নিজের এগারো বছরের পুরোনো গরদের থান পড়িয়ে, পুজোর নিয়ম বলে পড়িয়ে নেয় গত পঁয়তাল্লিশ বছরে প্রায় দু'হাজার বার পড়া মুখস্থ পাঁচালি-

"নারায়ণী বলে শুনো আমার বচন।
আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন।।"[৮]

হাসিকে অত্যন্ত আগ্রহভরে পরিচয় করিয়ে দেয় নিজের রোজকার সকালের ঘন্টা-ভরে কাটানো- শাশুড়ীর থেকে পাওয়া নারায়ন শিলা যেটি শাশুড়িও পেয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ির থেকে, কালীঘাট থেকে আনা গাছকৌটো, পুরী থেকে আনা পাথরের জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম মূর্তি, তারকেশ্বর থেকে আনা তারকনাথ, গায়ত্রীদেবী, গণেশবাবাজী, বালগোপালের সাথে। এইসব ঠাকুরদেবতাই যেন বিজলীবালার আত্মার সাথী।

বাড়ির ভাড়াটে হাসি ক্যান্সাররোগে মারা গেলে মন খারাপ হলেও নিয়মগুলো রক্ষা করতে ভোলে না বিজলিবালা।

"শ্মশান থেকে ফিরলে ওদের জন্য নিমপাতা, মটরডাল, লোহা, ঘুঁটের আগুন সদর দরজায় রাখতে হবে, এসব তো হিন্দুদের সংস্কার, মানা উচিত।"[৯]

কিন্তু এহেন বিজলিবালার সংস্কারের কাছে হার মানে স্নেহত্ব। পদ্ম যখন মৃত হাসির ছেলে ভুটুর গলায় চাবি পড়াতে যায় বিজলিবালা বলে-

"ওসব নিয়মটিয়ম রাখ তো। ...ও তো এক মিনিটেই গলা থেকে খুলে ফেলবে নয়তো মুখে পুরে দেবে। কাণ্ডজ্ঞান মেনে তো নিয়ম মানবি!"[১০]

সংস্কার-সম্পূর্ণা বিজলিবালার মানবিকতার ছোঁয়া পুরো কাহিনি জুড়েই রয়েছে। স্বামীগৃহে অত্যাচারিতা পদ্মকে আশ্রয় দিয়েছে। রথ দেখে ফেরার পথে রিকশা থেকে পড়ে যাওয়াতে সে রিকশাকে তো ভাড়া দেওয়া হয়ই না, উপরন্তু পিটুনি মারা হয়- এতে বিজলিবালা প্রশ্ন তোলে। অসহায় তপতীকে কাজ খুঁজে দেয়, সেই কাজে টান এলে টাকা দিয়ে নতুন কাজের ব্যবস্থা করে উৎসাহিত করে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত ভাড়াটে হাসির অসুস্থতার খবর নিয়েছে। হাসির সন্তান ভুটুর যত্ন-আত্তির করেছে। ভুটু পড়ে গেলে ভাঙা পা নিয়ে হামা দিয়ে এসে দেখেছে-

"কী করবো ভাই ছেলেটাকে তো দেখতে হবে। একটা অসহায় বাচ্চা, ভিখিরির ছেলে তো নয় ভদ্র বামুনের ঘরের ছেলে।"[১১]

বিজলিবালার ধ্যানধারণাতে ছেদ পড়ে যখন হাসিনা বানোর নামে চিঠি আসে বাড়ির লেটার বক্সে। মনে প্রশ্ন জাগে ভাড়াটে হাসি আর হাসিনা এক নয় তো? মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। হাসির গলার পাঁচালির সুর কানে ভেসে ওঠে, সে সুর কোনো হিন্দুকণ্ঠী মেয়ের ছাড়া অপরের হতে পারে না ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে। মনে পড়ে ভাড়া দেওয়ার সময় কি জাতি তারও খোঁজ নিয়েছিল বিজলিবালা, চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ বলেই থাকতে দিয়েছিল। বিজলীবালার নিষ্ঠান্বিত সংস্কারের জোয়ারে টান পড়ে, হাসির স্বামী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী জানায় তার স্ত্রী হাসিই হল হাসিনা বানো। জ্যোতির স্ত্রী মুসলিম বলে তারা এতোদিন ঘরভাড়া পায়নি। হাসি বিজলিবালার ঠাকুর ছুঁয়েছে, পাঁচালি পড়ে দিয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের চিঠির খামের ওপর লেখাটা দেখাটার আগে পর্যন্ত যে ধারণা ছিল বিজলিবালা যেন সেটাই বজায় রাখে।

কিন্তু বিজলিবালার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তার লালিত নিষ্ঠাবোধ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মুসলমানের মেয়ে হাসি শুধু ঠাকুরের সিংহাসনই ধরেনি; লক্ষ্মীর পাঁচালীও পড়েছে, হাসির ছেলে ভুটু নারায়ণ শিলা মুখে দিয়েছিল ওটাই বা কী করবে বিজলিবালা। এক কঠিন দ্বন্দ্ব তার সামনে এসে দাঁড়ায়। শিলাটি শুধু তার গর্ব না, পরিবারের সূত্র স্থাপনকারী ঐতিহ্য। সংস্কারের কাছে তার মানবিকতা পিছিয়ে পড়ে। সবার আগে সদ্য স্ত্রীবিয়োগে শোকাচ্ছন্ন এবং মুসলমান নারীর স্বামী জ্যোতি আর তার সদ্য মা-হারা ছেলে ভুটুকে বাড়ি থেকে বের করার কথা ভাবে সে। তার সংস্কারবোধ তাকে তীব্র আঘাত করে-

"...যে আঁচড় আমার বুকে পড়ল তার ঘা তো আর শুকোবে না... আমার এত দিনের ঠাকুর তাকে কত যত্নে আগলে রেখেছি, আমার এত দিনের পুজো এত দিনের ভক্তি সব সব তোমরা মিথ্যে করে দিলে নস্যাৎ করে দিলে।"[১২]

মানবপ্রেমের কাছে সংস্কার হার মানে। জ্যোতি বাড়ি ছাড়লেও বিজলিবালা ভুটুকে রাখে। মা-হারা ভুটু কোথায় সঠিক যত্ন পাবে সে বিষয়ে জ্যোতিকে পরামর্শ দেয়। হাসির বাবার চিঠি খুঁজে পায় বিজলিবালা। হিন্দু ছেলেকে বিবাহ করার জন্য তারা হাসির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি, বিজলিবালার মনে হয় 'জাত ধর্মটাই বড় হল'। সংস্কার, স্নেহ-মমতার কাছে এসে হার মানে। মমত্ববোধের কাছে বিজলিবালার সংস্কার বিলীন হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে ভালোবাসার কাছে ধর্ম হেরে যায়; মনুষ্যত্বের জয় হয়। '...হাসি নিছকই মুসলমান মেয়ে নয়, হিন্দুর বউও নয়, ও একটা মানুষ।' ভুটুকে তার পরিবারের কাছ, আপনজনদের কাছে ফেরাতে চেয়েছিল, কিন্তু জ্যোতির পরিবার মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এরপরে বিজলিবালার মধ্যে এক অন্য মানবতাবোধ দেখা দেয়। সংস্কার আর মানবিকতার দ্বন্দ্ব নয় এ; দুটো সম আসনে উপস্থিত হয়েছে। ছোট্টো ভুটু আবার বিজলিবালার সিংহাসন তছনছ করেছে, নারায়ণ শিলা খাটের তলায়, রাধাকৃষ্ণ মেঝেতে পড়ে। বিজলিবালা মুসলিম মায়ের সন্তান এসব করেছে বলে এবারে আর সেসব ঠাকুর বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবে না। ভুটুকে নিজের উত্তরসূরি ভাবে। পদ্মকে জানায়—

"তোকে আর গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিতে হবে না, মুক্তি দেবার লোক আমি পেয়ে গেছি।"[১৩]

একজন সংস্কার-পরিপূর্ণা নারীর কাছে তার নিয়ম-কানুন, নিষ্ঠার মূল্য অনেকটা। তার সেই নিষ্ঠাতে আঁচড় লাগলে সেই আঘাত সাধারণত সে সহ্য করতে পারে না। আর প্রসঙ্গ যখন ধর্ম, শিক্ষিত আধুনিক-মনস্ক চেতনাও সেখানে চাপা পড়ে যায়। ধর্মের সংকীর্ণ আবৃত্ত থেকে একমাত্র মানবিকতাই পারে ধর্মকে কোণঠাসা করতে-

"মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবে।"[১৪]

ধর্মকে লেখক এখানে একপাশে সরিয়ে দিয়েছেন। সংস্কারের দ্বন্দ্বে মানবিকতার কণ্ঠরোধ না করে, দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিতেই সংস্কারের শ্বাসরোধ করেছেন। কাহিনীতে এই দ্বন্দ্বের প্রয়োজন ছিল। নয়তো সংস্কারই একাধিপত্য করত। সংস্কারের আবরণ উন্মোচন করে মানবিকতার উত্তরণ হয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. নন্দী, মতি, 'বিজলিবালার মুক্তি', (ডিসেম্বর ২০০২), সুবর্ণসংগ্রহ উপন্যাস, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৩
২. তদেব, পৃ. ৯
৩. তদেব, পৃ. ১৪
৪. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১০, পৃ. ১৬
৫. নন্দী, মতি, 'বিজলিবালার মুক্তি' (ডিসেম্বর ২০০২), সুবর্ণসংগ্রহ উপন্যাস চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৮, পৃ. ১৩
৬. তদেব, পৃ. ১৬
৭. তদেব, পৃ. ১৭
৮. তদেব, পৃ. ১৮
৯. তদেব, পৃ. ৩৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৯
১১. তদেব, পৃ. ৩৫
১২. তদেব, পৃ. ৪৪
১৩. তদেব, পৃ. ৫৩
১৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা', প্রথম প্রকাশ, শুভম প্রকাশনী, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০১২, পৃ. ৭০৫